অন্নদাসুন্দরী ঘোষের কবিতাবলী

যশোধরা রায় চৌধুরী

ঘুমঘোরে ছিনু অচেতন!
হিমানী কম্পিত হিয়া ঢাকা ছিল আবরণে
অফুটন্ত যুগল নয়ন!
চাহিনি সংসার পানে, ধারিনি কাহারো ধার ;
আঁখিভরা ঘুম!
আমি ছিনু ..আমি.. লয়ে, দেখিনি ভবের ওই
আনন্দের ধূম!

উপরের এই লাইনগুলোকে একঝলক দেখলে রাবীন্দ্রিক মনে না হয়ে পারে না। তবে যাঁর লেখা, তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িকই বলা চলে। অন্নদাসুন্দরী ঘোষ, যাঁরা জীবদ্দশা ১৮৭৩ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ। যে জীবদ্দশাব অধিকাংশই কেটেছে পূর্ববঙ্গে, মৃত্যুর আগে দু চার মাস ছাড়া। পূর্ববঙ্গ বলতে আমরা এখন বুঝি বাংলাদেশ। তখন তা ছিল বাঙালির আত্মার অংশ। তাই তাকে পূর্ববঙ্গ বলে আলাদা করে চিহ্নিত করার প্রয়োজনও সে সময়ের মানুষের ছিল না। অন্নদ াসুন্দরী রামচন্দপুরের কন্যা। তদানীন্তন বাখরগঞ্জ জেলায় এখান যাকে বরিশাল অঞ্চল বলি একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম র ামচন্দ্রপুর। তাঁর জন্ম ভূম্যধিকারী গুহবংশে, যে পরিবার রামচন্দপুরে ছিল যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবার। ভাইয়েদের মধ্যে কেউ হাইকোর্টের উকীল তো আর একজন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। এরকম পরিবারে যে বিদ্যাচর্চার একটা ঝোঁক থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সে-সময়েও লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মেলবন্ধ আশর্চ্য করত লোককে। এই পরিবারের দুয়েরই আর াধনা চলত। অন্নদাসুন্দরীর শৈশবকালে মেয়েদের পড়াশুনা করার রেওয়াজ একেবারেই ছিল না। তৎসত্ত্বেও অন্নদ াসুন্দরীর বাংলা ভাষায় যথেষ্ট অবদান ছিল। তবে, আজকালকার ধরনে রীতিমত বিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষ ার চল ছিল না। ইংরিজি শিক্ষার তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। ভাইয়েদের সাথে বাড়ির পাঠশালায় গুমহাশয়ের কাছে বসে হাতের লেখা চর্চা ও বাংলা ভাষার শিক্ষায় কিন্তু অন্নদাসুন্দরীর উৎসাহ ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই সত্যটা হয়ত আমাদের একবিংশ শতকীয় মানসে ভালো করে প্রতিভাত হওয়াই মুস্কিল যে ইংরিজি শেখার সঙ্গে একজন মানুষের বাকি শিক্ষাদীক্ষার কোনো যোগ নেই। একজন মানুষকে শিক্ষিত কখন বলব, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা এতটাই খন্ডিত এবং একপেশে যে অন্নদাসুন্দরীর মত মেয়েদের বাংলাভাষার ব্যুৎপত্তি ও জ্ঞানের গভীরতা বুঝতে আমাদের বেশ কষ্টই হবে। যেমনটা হয় একজন কৃষক বা লোকশিল্পীকে শিক্ষিত বলতে, কারণ জ্ঞান, কলাকুশলতা এবং কোনো বিষয়ে পারঙ্গ মতাকে আমরা শিক্ষা বলে ভাবতে শিখিনি, ইংরিজি অক্ষর পরিচয়কেই আমরা একমাত্র শিক্ষা বলে জানতে শিখেছি। বা বলা ভাল আমাদের এরকম শেখানো হয়েছে। তাই তথাকথিত একজন নিরক্ষর আমাদের বাচনে হয়ে যায় অশিক্ষিত। যেমন গ্রাম্য আমাদের বাচনে আজ অসংস্কৃত, দীন, হীন এবং have - not এর সমার্থক। বর্ধিষ্ণু গ্রাম নামক ব্যাপারটা সে-যুগে, কেমন ছিল, আমাদের প্রজন্মের মানুষের মাথায় তা ঢুকবেই না। অথচ একদা গ্রামই ধরে রেখেছে, বাঙালির সংস্কৃতি শিরদাঁড়াকে। যাই হোক্ অন্নদাসুন্দরী যে শুধু গুমশায়ের পাঠশালাতে গিয়েই বাংলা ভাষা শিখেছিলেন তা নয়।

যদিও গুমশায় নামে যে বেত- হাতে কার্টুনের মত হাস্যকর বৃদ্ধের ছবি আমাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, এই গুমশায় তেমন ছিলেন না। রাজকুমার সরকার নামে এই গুমশাই ঐ অঞ্চলের সুবিখ্যাত শিক্ষক, হস্তাক্ষরের সৌন্দর্যের জন্য যথেষ্ট তাঁর খ্যাতি ছিল, ফলত ছেলেমেয়েদের হাতের লেখা ভাল করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। এই সব প্রশিক্ষণ ছাড়াও, ঐ সময়ে বাখরগঞ্জ জেলায় অন্তঃপুরে স্ত্রী শিক্ষা প্রচারকল্পে বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্যারিষ্টার প্যারীলাল রায় এবং মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, রিপন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমৃতচন্দ্র ঘোষ প্রমুখরা। মেয়েদের নানারকম পরীক্ষা নেওয়া হত এই সভার তরফ থেকে। অন্নদাসুন্দরী এই সভার বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বার বছর বয়সে, যখন অন্নদাসুন্দরীর বিয়ে হয়, তাঁর আগেই তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করা হয়ে গিয়েছে তাঁর।

বাড়িতে বসে অনেক বইও পড়া চলত অন্নদাসুন্দরীর। বিয়ের আগে, এবং পরেও সেইসব পড়া অব্যাহত ছিল। মানে, সংসারের পাকে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত। আর তখনই পাশে পাশে চলতে থাকে তাঁর কবিতারচনা। রঙ্গলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মানকুমারী, কামিনী রায় এঁদের লেখার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর। অন্যদিকে ঐতিহাসিক রচনা পাঠেও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল অন্নদাসুন্দরীর। এছাড়া বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্প এসব পড়ার চল তো ছিলই। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে গভীর বেষ্টনের মধ্যে সারক্ষণ জারিয়ে থাকত বাঙালির চিন্তা ও মনন --- তারই অত্যন্ত স্বাভাবিক ফল অন্নদাসুন্দরীর কবিতা রচনার প্রয়াসগুলি। তখনকার পত্রিকা অন্তঃপুর, দাসী, বামাবোধিনী ইত্যাদিতে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। পরে বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী, ছাত্রবন্ধু ইত্যাদি পত্রিকাতেও প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় শতাধিক কবিতার সঙ্কলন কবিতাবলী বার হয়েছিল ১৯৪০ সাল নাগাদ, অন্নদাসুন্দরীর বড় ছেলে দেবপ্রসাদ ঘোষের উদ্যোগে। বইটিতে দেখছি শতাধিক কবিতাকে কয়েকটা বড় ভাগে ভাগ করা যায়। সবচেয়ে মুখ্য বিষয় প্রেম, যথেষ্ট সুলিখিত প্রেমের কবিতা অনেকগুলিই পাচ্ছি এই বইতে। দ্বিতীয় বড় গোষ্ঠীটি হল অন্যান্য বিষয়ের উপর আনুষ্ঠানিক কতগুলি কবিতা। কবিতাগুলি পড়লে বোঝাই যায়, এগুলি কোনো না কোন উপলক্ষে বিশেষ করে লেখা হয়েছিল, যেমন পুত্রদের কৃতিত্বলাভ, স্বামীর জন্মদিন, মাঘোৎসব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙালি সৈন্যদের বরিশালে অভিনন্দন উপলক্ষে রচিত কবিতা, ইত্যাদি। এমনকি, পুত্রবধূর জন্মদিনের আশীর্বাদ বা কন্যা শান্তিসুধার বি.এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার ও ঈশান-বৃত্তি লাভ উপলক্ষেও কবিতা পাচ্ছি এই গ্রন্থে। অবশ্যই, কাব্যগুণের দিক থেকে এই কবিতাগুলির তুলনায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের কবিতাগুলির আকর্ষণই পাঠক হিসেবে আমার কাছে বেশি। আর একটা বিভাগ বলা যায় নানা দার্শনিক চিন্তা বা অনুভূতির কবিতাকে, প্রেম ছাড়া অন্যান আবেগ উদ্দীপনা, যেমন দেশপ্রেম, ত্যাগ, বৈরাগ্য কিছু কিছু দার্শনিক প্রশ্ন ইত্যাদির দ্বারা চালিত কবিতা, এই ধারাটিও সম্ভবত, ওই আনুষ্ঠানিক, বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত কবিতা গুলির মতই, অন্নদাসুন্দরীর পরিণত বয়সের, অপেক্ষাকৃত সাংসারিক, আত্মস্থ অবস্থায় লেখা। উদ্বেল আবেগাতুর ভাব স্পষ্টতই এই স্তরে এসে কমে এসেছে ---- আন্দাজ করা যেতে পারে যে সেইসঙ্গে কমে এসেছে তাঁর কবিতা লেখার অবসর ও সময়ও। সাংসারিক কাজকর্মের ফাঁকেফাঁকেই হয়ত তখন লিখে ফেলেছেন মাঝে মাঝে। কখনো হয়ত কোনো পত্রিকার সম্পাদকের তাড়নায় বা উপরোধে পড়ে লিখতে হচ্ছে একটি বিশেষ উপলক্ষ্য বা অনুষ্ঠানের কবিতা।

অন্নদাসুন্দরীর লেখায় প্রেমের কবিতার আধিক্য দেখে আমাদের আধুনিক মনে একটা প্রশ্ন জাগে ঃ যে মেয়ের বিবাহ বারো বছর বয়সে, তার মানসে, সে যুগের প্রেক্ষিতে, বিদেশী লাভ ব্যাপারটা কতটা ফুটছে ?অথবা, নানা গল্প কবিতা- উপন্যাসে পড়া বিদেশী ভাবের অনুসারী কৈশোর প্রেম ব্যাপারটা কতটা ছায়াপাত করত এই সদ্যকিশোরীর মনে? বিশেষত যখন আমরা জানি যে বিবাহকালে অন্নদাসুন্দরীর স্বামী ক্ষেত্রনাথ ছিলেন বছর ষোলর এক যুবা, পড়তেন ফোর্থ ক্লাসে, বরিশাল জেলা স্কুলে। স্বামীর পঠদ্দশায় অন্নদাসুন্দরী কখনো পিত্রালয়ে কখনোশ্বশুরালয় গাভাতে সময় কাটাতেন। দুই গ্রামই কাছাকাছি, তাই অল্পবয়সী অন্নদাসুন্দরীর তখন একটা ঢিলেঢালা স্বপ্নময় সময় কেটে থাকাই স্বাভাবিক। এরপর স্বামী পড়তে গেলেন কলকাতায়। এফ.এ. অব্দি তিনি বরিশালেই ব্রজমোহন কলেজে পড়েছিলেন। কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে

এফ.এ. পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন ক্ষেত্রনাথ, ইংরাজি ও দর্শন শাস্ত্রে ডবল অনার্স নিলেন ১৮৯৩ খ্রীষ্ট াব্দে। আমাদের কাছে এসব গল্প কথার মতই লাগে। ১৮৯৪তে ক্ষেত্রনাথের প্রথম সন্তান দেবপ্রসাদের জন্ম। অর্থাৎ ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৪ এই বছর আষ্টেক সদ্যকিশোরী অন্নদাসুন্দরীর পরিপূর্ণ রোম্যান্সের কাল। তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিশেষ স্ফুরণও দেখা যায় এই সময়েই। জীবনের সবচেয়ে বর্ণময় স্বপ্নালু এবং রাগরঞ্জিত সময়েই তো প্রেমের কবিতা লেখার শ্রেষ্ঠ সময়। বিশেষত উনবিংশ শতকের ঐ শেষভাগে, প্রেম যখন দ্বিবাহীন, সংকটহীন, স্পষ্ট এবং আলোকোজ্জ্বল এক দিশা --- আমাদের সময়ের মত ধুঁধলা অস্পষ্টতার, বেদনার, সংশয়ের মালিন্যে হারিয়ে যাওয়া নয় !

দেখছি এই রচনাগুলির মধুর মায়ালু ভাব, অথচ আবার সহজ, সরাসরি কথা বলার নিজস্ব ঢং অন্নদাসুন্দরীর তখনই অ ায়ত্ত। ১৮৯২ তে লেখা কবিতা ঃ সেই যে গিয়াছ চলে,/ আবার আসিবে না কি ?/ আবার প্রেমাশ্রুধারা /হবে না কি ম াখামাখি ?..... তারকারাজিত ওই , /নীলিমা আকাশতলে/ শারদ জ্যোছনামাখা/ অবনীর শান্তিকোলে/ক্ষিপ্ত বাহু পসারিয়া/ ভাঙ্গা বুক বিদারিয়া/দোঁহে আলিঙ্গিব দোঁহে /আপনারে যাব ভূলে...

আরো সুন্দর কবিতা দেখছি এর পরেই, ১৮৯৩ তে লেখা ..এখনো বাস ভাল?... যার একটা দুটো লাইনেই পাচ্ছি শীতল মায়াময় এক প্রেমের স্পর্শ ঃ
এখনো বাস ভাল ? এখনো পড়ে মনে
সে ঢেউ যমুনার, চাহনি মুখপানে ?.....
নিশীথ মধুময!
ঝিল্লীরা জেগে রয়----
প্রেমের খেলা তারা, দেখেছে কত সুখে !.....
এ প্রাণ তুমিময়,
কি তব মনে লয় ?
জানে না রাধা আর বিহনে শ্যাম কাল!
এখনো পড়ে মনে ? এখনো বাস ভাল ?

অথবা প্রাতুর আরো একটি কবিতা পড়লে মনে হয়, প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কবিতা লেখার রীতি অন্নদসুন্দরীর এক নিজস্ব স্ট াইল হয়ে উঠেছিল ঃ
কেন এ জীবন?
কেন এ ভুবনন
কেন এ মমতা স্নেহ ?
কেন এ পিয়াস ?
কিসের আশ্বাস?
কেন বা এমন মোহ ?
....
হরিণ -- নয়ন
হেরিলে লোচন
কেন মনে পড়ে তায় ?
ঝাউততলে
মলয় -- হিল্লোলে
কেন গো সে খেলে যায়?

...
যা কিছু আমার
সকলি তাহার ---
তবু সে কেন আমার নয় ?

এর পাশাপাশি অনেকটাই নিষ্প্রভ লাগে এই উদ্দীপনাময় উপদেশ -- ভিত্তিক কবিতা, যা বস্তুতই অনেক পরে লেখা ঃ
সংসার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, করমের স্থান।
সাজে কি হেথায় কভু মান - অভিমান ?
ভুলিও না মহত্তত্ত্ব
হারায়ো না মনুষ্যত্ব
কর্মক্ষেত্রে দ্রুত পদে হও ধাবমান ।.... ইত্যাদি
অথবা,
যাহা হতে তব সৃষ্টি,স্রষ্টা তিনি সরকার।
আত্মপর ভেদ - জ্ঞান কর সবে পরিহার!

এসব কবিতায় সেকালের উল্লেখযোগ্য মহিলা-কবি কামিনী রায়ের চিরপরিচিত ঢং চোখে পড়ে সেই সময়ের প্রেক্ষিতেই অন্নদাসুন্দরীকে দেখতে হবে। বিষয়ের অভিনবত্ব কিছু না থাকলেও, সেই ঘোর সংসারী, সন্তানপালন রান্নাবান্না এবং কঠোর শারীরিক শ্রমে ব্যাপৃত, কঠিন সামাজিক মহিলাটির কলমের ডগায় যে আদৌ কবিতার উন্মেষ ঘটত এটাই আমাদের কাছে আশ্চর্যের ।আরো যা আশ্চর্যের তা হল আমরা এখন দেখছি এই বিষয়ে অন্নদাসুন্দরী একাই নন, বা কোনো বিশেষ ব্যতিত্রমও নন। অন্নদাসুন্দরীকে আমরা দেখতেই পারি বাঙালি জীবনের এক বিশেষ সময় গ্রন্থির ফসল হিসেবে। এক বিশেষ সামাজিক অবস্থায়, শিক্ষিত, গ্রামীণ কিন্তু ত্রমশই শহরমুখী, হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধ্যের স্বাভাবিক সতেজ ভাষাপ্রেমের আমরা একাধিক উদাহরণ পাব একটু নিবিষ্ট ভাবে বাংলার সাহিত্যিক -- কবি -- অধ্যাপকদের মায়েদের বোনেদের জীবনের দিকে তাকালেই। কবি জীবনানন্দ দাশের কলমে পাচ্ছি তাঁর মা কুসুমকুমারী দেবীর বিষয়ে এই স্মৃতিচারণ ঃ

আমার মা শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দেবী.... তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা ছাড়া অন্য কোনো লেখা আমাদের কারো কাছে নেই, এখন সেসব কবিতাও খুঁজে পাচ্ছি না, বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার ফলে অনেক দরকারি জিনিষ বরিশালে ফেলে রেখে পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে হয়েছে..... সংসারের নানা কাজে খুবই ব্যস্ত আছেন ... এমন সময় ব্রখাবাদী-র সম্পাদক আচার্য মনোমোহন চত্রবর্তী এসে বললেন, এখুনি...কবিতা চাই ... শুনে মা খাতাকলম নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে এক হাতে খুন্তি আর এক হাতে কলম নাড়ছেন ... তখনকার দিনের সেই অস্বচ্ছল সংসারের একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠলো না আর, কবিতা লেখার চেয়ে কাজ ও সেবার সর্বাত্মকতার ভেতর ডুবে গিয়ে তিনি ভালোই করেছেন হয়তো...

হুবহু এই বর্ণনাই পাই অন্নদাসুন্দরীর অতি পন্ডিত কন্যা শান্তিসুধার স্মৃতিচারণে, যখন বাঙালি সৈনিকদের সম্বর্ধনাসভায় পাঠের জন্য অন্নদাসুন্দরীকে অনুরোধ করা হচ্ছে কবিতা রচনা করতে, আর রান্না ফেলে উঠে তিনি লিখে দিচ্ছেন চটজলদি এক কবিতা...।

এখানেও উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত গৃহকর্ম ও সংসারের বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে থেমে যাওয়া কাব্যস্ফূর্তির ইতিহাস---- আর এক তথাকথিত কৃতী পুত্রের তাকে ইতিহাসের চোখে স্বীকৃত ও যথাযথ করে তোলার প্রয়াস, যাকে আমরা বলি জা

স্টিফিকেশন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের এলিট শিক্ষিত রাঙালির সংসারের মেয়েদের জীবনে যে অদ্ভুত দ্বিচারিতা বা ড াবল স্ট্যান্ডার্ডের তখন শু --- বুদ্ধির দৌড়ে স্বামীপুত্রের থেকে পিছিয়ে না থেকেও ধান কোটা ঘর নিকোনো -- সন্তানপ ালন -- রাঁধাবাড়ার মধ্যে ব্যস্ত মায়েদের সৃষ্টিশীলতার ক্রমাগতই হেরে যাওয়ার সূত্রপাত,যার জের সম্ভবত এখনও টেনে চলেছি আমরা মেয়ে লেখকরা। ঠিক এই একই justification এর সুর দেখছি কবিতাবলীতে মুখবন্ধ হিসেবে অন্নদ াসুন্দরীর পুত্রের লেখা পরিচয় অংশে ঃ

শ্বশুরালয়ে শীঘ্রই অন্নদাসুন্দরী কর্মকুশলতা ও রন্ধন - নৈপুণ্যের জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন .... গ্রন্থাদির চর্চাও কিছু কিছু চলিতে লাগিল, স্বামীও তাঁহাকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত পড়িবার জন্য ভাল ভাল বই কিনিয়া দিতে লাগিলেন।... তিনি অবসর পাইলেই কবিতা লিখিতে লাগিলেন। তখন অন্নদাসুন্দরীর ঊনিশ - কুড়ি বৎসর বয়স, সন্তানাদি হয় নাই ঃ গৃহকর্মের মধ্যে যেটুকু অবকাশ পাইতেন, সুবিধা পাইলেই কবিতা - চর্চ্চায় সেটুকু ব্যয় করিতেন। এই যে কবিতা - রচন ার অভ্যাস প্রথম জীবনে তাঁহার আয়ও হইল, উত্তরজীবনেও কখনই ইহার একেবারে বিরতি হয় নাই। অবশ্য সন্তানাদি জন্মের হঙ্গে সঙ্গে এবং পারিবারিক কার্যকলাপ ও গৃহকর্মাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় হিন্দু - গৃহিণীর অবসর সময় ক্রমশই বিরল হইয়া আসে , এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই।

আসলে পুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর কাব্যচর্চার ব্যাপারটা অনেকটাই নির্ভর করল পরিবারের পুষদের উৎসাহদানের উপরে। যাকে উপহাসভরে পৃষ্ঠপোষকতা বা পিঠ-চাপড়ানিও বলা যেতে পারে। কিন্তু সে - রচনা কখনোই এতটা গুত্ব পেতনা যে অন্যান্য সাংসারিক কাজের মূল্যে তা করা যেতে পারে। সুতরাং মেয়েদের গৃহকর্ম্মনিপুণতার দাবি মেটাবার পরে, অন্নদাসুন্দরীর কাব্যচর্চা হয়ে রইল একটা অলংকারমাত্র, নকশি কাঁথা রচনার মত, বা ফুল তোলা বালিশের ওয় াড় পরাবার মত, মাঝেমধ্যে কবিতা লেখার অভ্যাস নিছকই এক আভূষণ হয়ে রয়ে গেল। যে পরিবারে একবার বিদ্যাচর্চ া বা সাহিত্যচর্চার ভূত ঢুকছে সে পরিবারে বংশানুক্রমিক ভাবে সে চর্চা চলেছে, বঙ্গসমাজেএই উদাহরন বিরল নয়। অন্নদাসুন্দরীর ক্ষেত্রেও এমন এক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। জ্ঞানতপস্বী স্বামীর কবি স্ত্রী যথেষ্টই নাম অর্জন করেছিলেন ঐ সময়ে, যোগেশচন্দ্র বাগলের বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থে তাঁর নামোল্লেখ পাচ্ছি আমরা, পাচ্ছি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য ায়ের বঙ্গ সাহিত্যে নারী বা রমেন চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যের মহিলা সাহিত্যিক গ্রন্থেও আর হয়ত তাঁরই উৎসাহে তাঁর কৃতী কন্যাদের মধ্যেও বীজাণুর মত ছড়িয়ে পড়েছে পড়াশুনা --- কাব্যচর্চার আগ্রহ। পুত্রবধূও বাদ ছিলেন না। অন্নদ াসুন্দরীর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবপ্রসাদ ঘোষ অঙ্কবিদ্ (এবং একাধারে রাজনীতিকত্ত)ছিলেন, খ্যাতিমান ছিলেন নানা জ্ঞানের অ াকর হিসেবে। তাঁর স্ত্রী শোভারাণীও সংস্কৃতে বিএ পাশ করেছিলেন কলকাতা ঝিবিদ্যালয় থেকে। শোভারাণীর স্মৃতিকথ াতেই পাচ্ছি অন্নদাসুন্দরীর সম্বন্ধেএমন সরস বর্ণনা ঃ আমার মনে পড়ে মাটির ঘর কি করিয়া নিকাইতে হয় তাহা তিনি আমাকে নিজহস্তে শিখাইয়া দিলেন। দেখিলাম এই নিকানোর মধ্যেও একটা আর্ট বা রচনাশিল্প আছে। মাটি গোবরজল মিশাইয়া একটি ন্যাতা হাতে লইয়া ঘরের এককোণ হইতে আরম্ভ করিতে হয়, তারপর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া লেপন করিতে করিতে আরেক কোণায় আসিয়া শেষ করিতে হয়।.... ওখানে রান্না হইত কাঠে। কাঠওয়ালা এক গাটি করিয়া কাঠ প্রায়ই দিয়া যাইত । সেই কাঠগুলি আমি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গুছাইতাম, তাহারও একটা কৌশল ছিল । চারখানা করিয়া কাঠ একটার উপর আরেকটা দিয়া মস্ত একটা চৌকা উচুঁ মাচা করিতে হইতে।.... এরপরে আমি মায়ের সঙ্গে র ান্নাঘরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। বরিশালে রান্নার বিশেষত্ব দেখিলাম এই যে, খুব কম তেলমশলায় রান্না হইলেও খ াবার খুব সুস্বাদু হয়, এবং প্রায় প্রতি তরকারীতে নারিকেলের প্রক্ষেপ পড়াতে স্বাদ যেন খোলে।.... সে দিন আমি মাছ র ান্না করিতে বসিয়াছি --- মাছটা ছিল ইলিশ --- দাম ছিল তার তখন ছ পয়সা কি দু আনা, ওজন ছিল দেড় সেরের মত। কিছু মাছ ভাজা ও কিছুঝোল হইবার কথা ছিল। আমি কড়াইতে তেল চাপাইয়াছি, মাছ ভাজিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি, এমন সময় মা পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, শোভা, ওকি করেছ ? সব তেল ঢেলে রাখো। এ মাছ ভাজতে তেল লাগে না।আমি তো অবাক। তখন সেই তেল অন্য পাত্রে ঢালিয়া রাখিয়া উনানের উপর অল্প আঁচে কড়াইতে ম াছের খন্ডগুলি সাজাইয়া রাখিয়া ... দেখিতে পাইলাম কুলকুল করিয়া মাছের গা হইতে তেল বাহির হইতে লাগিল এবং

মাছের তেলেই মাছ ভাজা হইয়া গেল। (আজো তারা পিছু ডাকে। শোভারাণী ঘোষ)

দৈনন্দিন নারীজীবনের এই স্মৃতিচারণগুলো আমাদের কাছে কাহিনীর মতই সুখশ্রাব্য ও আগ্রহ উদ্রেককারী। আমরা যেহেতু এই জীবনকে আর চোখের সামনে দেখতে পাইনা, নষ্ট্যালজিয়ার পরতে আরো মায়াময় মনে হয় এসব গল্পকে। তবু, এই রসঘন, জমজমাট নারীজীবন, যা মাখামাখি হয়ে ছিল খই ভাজা, ধানভাঙার গন্ধে, তার কোনো স্পর্শই কিন্তু লাগেনি অন্নদাসুন্দরীর লেখা কবিতায়। তাঁদের জীবনের কালানৈপুন্য, সাংসারিক কুশলতা যতটাই বেশি হয়ে থাকুক, তা কোনোভাবে ছায়াপাত করেনি তার লেখার বিষয়কে। বিষয় রয়ে গেছে অ্যাবস্ট্র্যাকট ও দিনগত জীবনের থেকে সম্পূর্ণ এলিয়েনেটেড, বিচ্ছিন্ন। হয়ত সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক সমাজের সাহিত্যচর্চায় মাটির সঙ্গে যোগাযোগ থাকা দুর্লভ বলেই, হয়ত পুষের হাত থেকে হস্তান্তরিত হয়ে আসা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা অন্নদাসুন্দরীকে আদৌ প্রণোদিত করেনি তাঁর মাটির নিকটে থাকা প্রত্যন্ত অনুভূতিগুলিকে লেখায় তুলে ধরতে, যেঅনুভূতিগুলি জড়িয়ে থাকে কাঠের উনুনের আঁচ বাড়ানো - কমানোর রহস্যে, অথবা উথলিয়ে ওঠা দুধ জ্বাল দেওয়ার উত্তেজনায়। রঙ্গলাল - নবীনচন্দ্রের ঘরানাকে অনুকরণ করে গড়ে ওঠা ভাষাবিশ্বের ভেতরে প্রবেশাধিকার পায় না, পায়নি অন্ত্যজ শব্দেরা, যারা এইসব নারীদের জীবনের প্রতিটি কোণা জুড়ে থাকত। তাই সমান্তরাল দুই স্রোতের মত অবিশ্বাস্যভাবে একসক্লুসিভ বা সংস্পর্শহীন থেকে গেছে কবি অন্নদাসুন্দরী ও সামাজিক, ব্যক্তি অন্নদাসুন্দরীর জীবন। ব্যাক্তির বেড়ে ওঠার ও ছড়িয়ে পড়ার সাথেই তাই অপমৃত্যু ঘটেছে কবির। দুটি স্রোতকে সাবলীলভাবে মিশিয়ে নিতে পারার অক্ষমতার জন্যই আজ বেশ প্রাণহীন ও কৃত্রিম লাগে অন্নদাসুন্দরীর আপাতসুগ্রধিথ, অতি যত্নে রচিত এই লাইনগুলি ঃ

কোথায় দাঁড়াই ?
আছে কোথা এ জগতে দাঁড়াবার ঠাঁই ?
কে দিবে থাকিতে গেহ ?
কে দিবে মমতা স্নেহ ?
সাদরে ডাকিবে কে বা, কার কাছে যাই ?
অনন্ত ব্রহ্মান্ডে হায়, কেহ মোর নাই !

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com